16

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সার্টিফিকেট অবৈধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছরে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ১৫শ' ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈধ সার্টিফিকেটধারী বলে ঘোষণা করেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এসব ছাত্র-ছাত্রী সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। এদের অধিকাংশই এখন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মকর্তা হিসাবে চাকরিরত রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার বিধান রয়েছে। তবে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাবসিডিয়ারী উত্তীর্ণের সনদ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ দুই শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় না। সাবসিডিয়ারী উত্তীর্ণ হওয়া এ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এ কারণে নির্ধারিত বছর ছাড়াও এমনকি অনার্স মাস্টার্স পাস করার পরও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে বলে জানা যায়।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি, এসব ছাত্র-ছাত্রী অনার্স ও মাস্টার্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলো কিভাবে? সার্টিফিকেট ছাড়া নিশ্চয়ই তারা সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়নি। প্রকাশিত রিপোর্টটিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর জালিয়াতি ও ভুল মার্কশীট প্রদানকে ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীর অবৈধ সার্টিফিকেটধারী হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা যায়, কথিত কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার যোগসাজশে ঐ ছাত্র-ছাত্রীরা অবৈধ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে। উভয় পক্ষের অংশগ্রহণে এই গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হলেও তুলনামূলক বিচারে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপরাধই বেশী। কারণ, তারা ঐ অবৈধ পন্থা অনুসরণের রাস্তা না দেখালে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তাতে শামিল হওয়া সম্ভব হতো না। এখানে লেনদেনের ব্যাপার যে ঘটেছে, সেটাও সহজে অনুমিত হয়। আরও একটি প্রসঙ্গ আলোচ্য খবরটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৯৯১ সনের ২য় বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে ১শ' জনকে আবার অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয় এবং তাদের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের এসব ছাত্র-ছাত্রী পুনরায় সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দেয় কিন্তু এখনও তাদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু পরীক্ষার ৬ মাস পরে তাদের সাবসিডিয়ারী ও অনার্সসহ সকল পরীক্ষা কেন বাতিল করা হবে না জানিয়ে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান অবস্থায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ঝুলে আছে। তারা বার বার ধরনা দিয়েও কোনো ফয়সালা পায়নি। লক্ষ্য করার বিষয়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে শুধু দুর্নীতি এবং বাঁ-হাতের কারবারই আসন পেতে বসেনি, অবহেলা, অব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্তহীনতাও তার কার্যক্রমকে দারুণভাবে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন করছে।

মার্কশীটে হেরফের, জাল সার্টিফিকেট প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও উঠেছে। বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত খবরা-খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের দুর্নীতি ও অপকর্ম অবলীলায় ঘটে যাচ্ছে। অন্যদিকে তো বটেই, আমাদের দেশেও অতীতে এ ধরনের ঘটনা ছিল কল্পনাতীত। পরিতাপ এই যে, দুর্নীতি, অপকর্ম-অপরাধ এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং এসব দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা যে অবাস্তব, আমরা তা মনে করি না। সচেষ্ট হলে, যথাযথ তৎপরতা প্রদর্শন করলে অবশ্যই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সকল জঞ্জাল সাফ করা সম্ভব। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশেষভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে একটি অনুপুংখ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত দৃষ্টান্তমূলক। এছাড়া যে সব বিষয় ঝুলে আছে সেগুলোর ত্বরিৎ ফয়সালা হওয়াও আবশ্যক। যে কোনো ব্যবস্থায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি কোনভাবে ক্ষুণ্ন হোক, তা কারোরই প্রত্যাশিত নয়।